কেশবচন্দ্র সেন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মমত।

কলিকতা তত্ত্ব-বিদ্যা সভাতে

শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ডি, এস, সি,

কর্ত্তৃক পঠিত।

ইষ্টবেঙ্গল প্রেস, ঢাকা।

শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৩ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

কেশবচন্দ্র সেন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মমত।

কলিকতা তত্ত্ববিদ্যা সভাতে

শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ডি, এস, সি,

কর্ত্তৃক পঠিত।

ইষ্টবেঙ্গল প্রেস, ঢাকা।

শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৩ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

1422.Cc.879.3.3.

মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মমত।

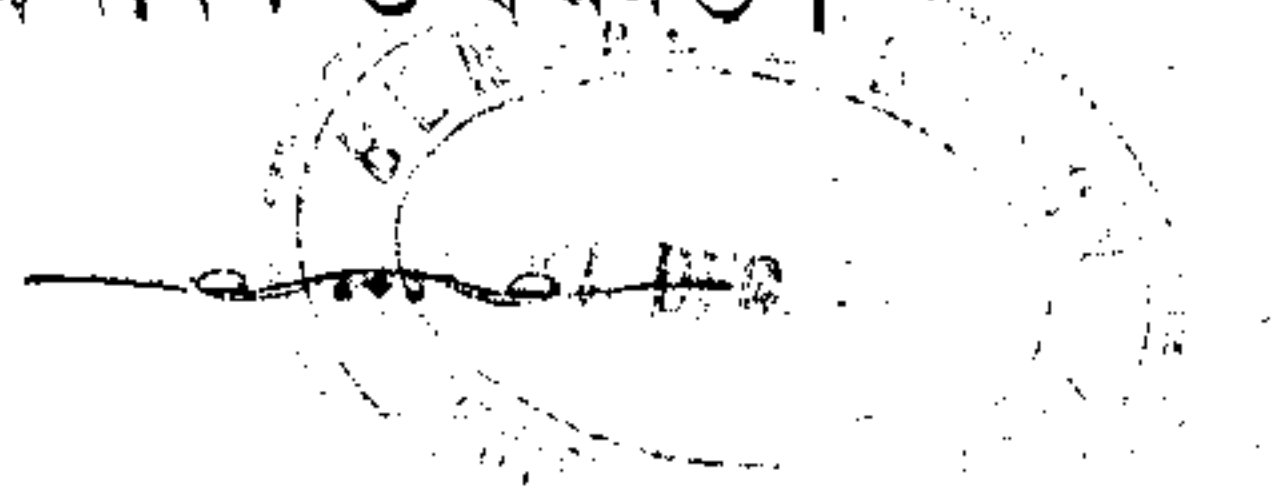

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মমত এত বিস্তৃত এবং কোন কোন অংশে এত জটীল যে একটী প্রবন্ধে তাহার সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়। আমি এ সম্বন্ধে কেবল সাধারণভাবে কয়েকটী কথা বলিব। ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র সেনের জীবন আদর্শস্থানীয় মনে করি, এজন্যই ইহার আলোচনা আমার নিকট প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। একটী জীবন যতই মহোচ্চ হউক না কেন উহাতে ভ্রমভ্রান্তি এবং ত্রুটী যথেষ্টই থাকিবে। কিন্তু সেই সকলের প্রতি একান্ত দৃষ্টি রাখিলে কোন মহাপুরুষই মানুষের আধ্যাত্মিক উপকার সাধনে সমর্থ হইবেন না। বিশেষতঃ কেশবচন্দ্র সেন আমাদের সমকালীন লোক, তাঁহার দোষ ত্রুটী আমাদিগের চক্ষের সমক্ষেই রহিয়াছে। তাঁহাকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে হইলে সে গুলিকে কতক পরিমাণে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া তাঁহার গুণ গুলির বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিলাম কেশবচন্দ্র সেনের জীবন আদর্শ স্থানীয় মনে করি। এইরূপ কেন মনে করি ইহা জিজ্ঞাসা হইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতিনির্ব্বিশেষে জন সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের যে আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে কেশবচন্দ্র সেনের জীবন তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল। সেই আদর্শ কি? একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব যে বর্ত্তমান শতাব্দীতে দুইটী ভাব সর্ব্বোপরি প্রবল;

(১) উন্নতি (Progress), (২) সামঞ্জস্য। মানব-জীবন স্বভাবতঃই উন্নতিশীল এবং জড়-জগত ও প্রাণি-জগতে ক্রম-বিকাশ নিয়ম রহিয়াছে। এইটী ঊনবিংশ শতাব্দীর একটী প্রধান ভাব। যিনি ইহা অগ্রাহ্য করিয়া কোনও ধর্ম্মতত্ত্ব অথবা সমাজতত্ত্ব প্রকাশ করিবেন তিনি নিশ্চয়ই অশিক্ষিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। বর্ত্তমান সময়ের কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, যাহাই কেন আলোচনা করি না, দেখিতে পাইব "উন্নতি" এবং "সামঞ্জস্য" এই দুইটী ভাব তাহার ভিতরে ক্রীড়া করিতেছে। ইংলণ্ডের দার্শনিক চূড়ামণি হারবার্টস্পেন্সার তাঁহার দর্শনকে Synthetic Philosophy বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জর্ম্মণিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত হেইগেলের দর্শনেও এই দুই মূলমন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মমত উভয়েরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি দার্শনিক ছিলেন না, কিন্তু দার্শনিক অপেক্ষা উচ্চতর আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দার্শনিক আপনার মস্তিষ্কগত চিন্তা বিধিবদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী; কেশবচন্দ্র সময়ের চিন্তা-স্রোত ও ভাব-স্রোত আপনার জীবনে সাধন করিয়াছিলেন। তিনি চরিত্র ও জীবন দ্বারা ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইঁহার জীবন স্থিরচিত্তে অনুধ্যান করিলে দেখিতে পাই যে তাহার ভিতরে সুন্দর একটী ক্রমবিকাশ রহিয়াছে। অনেক ধর্ম্মজীবন আছে যাহাতে উন্নতির আভাসও পাওয়া যায় না। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল আজও তাহাই। চিন্তার উন্নতি নাই, ভাবের উন্নতি নাই; এবং চরিত্রেরও স্ফূর্ত্তি নাই। একইভাবে চলিতেছে। অল্পদর্শী লোকেরা স্বভাবতঃ এই সকল জীবনেরই প্রশংসা করিয়া থাকে, কেন না তাহাতে মতের অস্থিরতা দেখিতে পাওয়া যায় না। উন্নতিশীল জীবন যদিও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে মত ও ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, তথাপি জীবনের অভ্যন্তরে এক স্থায়ী ভাব ও চিন্তা নিগূঢ় রূপে কার্য্য করে। আপাততঃ বাহ্যিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া চিন্তা বিহীন সমালোচকগণ উন্নতিশীল জীবনে চাঞ্চল্য দোষ আরোপ করিয়

থাকে। কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে এত বিবিধ প্রকারের কার্য্য-কলাপ ও ভাবোচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার ভিতরে একত্ব কোথায় রহিয়াছে স্থির করা সহজ নয়। কার্য্যকলাপ ও ভাবোচ্ছ্বাসের ভিতরে পড়িয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তিনি যে স্ববিরোধিতা-দোষে দোষী হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে ভাব ও চিন্তাটী তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কেন্দ্রস্থানীয় হইয়াছিল তাহা একইভাবে থাকিয়া যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত ক্রমিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনের জীবন বাস্তবিকই উন্নতিশীল। কি প্রণালীর ভিতর দিয়া এই উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম বয়সে তিনি অধ্যয়নশীল ছিলেন। পাঠ ও গবেষণা তাঁহার জীবনের ভূষণ হইয়াছিল। তাঁহার জীবনবেত্তা বলেন, তিনি প্রতিদিন আট দশ ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন। কলিকাতার মেট্‌কাফ্‌ হল্‌ তাঁহার অধ্যয়নের ক্ষেত্রভূমিরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিনি এই সময়ে দর্শন শাস্ত্রের সমধিক আলোচনা করিতেন এবং এই আলোচনা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত দার্শনিক ভিত্তি কোথায় ইহা আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অধ্যয়ন ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যশীলতাও এই সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার প্রথম জীবন চিন্তা-প্রধান। তিনি দর্শন ও ধর্ম্মের কূটপ্রশ্ন সকল চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। ভারবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্ব হইতেই কার্য্যশীলতা তাঁহার জীবনে প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি নানাপ্রকার সমাজ সংস্করণ কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানাপ্রকার কুরীতি, দুর্নীতি ও কুসংস্কার তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াছিল। তিনি কেবল উপাসনা লইয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না; সমাজ-সংস্করণ-কার্য্যও ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অতএব তাঁহার জীবনে উন্নতির দ্বিতীয় সোপান কার্য্যশীলতা। কাল-ক্রমে এই কার্য্যশীলতার মধ্য দিয়া ভক্তি-নদী প্রবাহিত হইল।

ইহা ব্রাহ্মসমাজে একটী অভূত-পূর্ব্ব ঘটনা। মহাত্মা শ্রীচৈতন্য এই সময়ে কেশবচন্দ্রের জীবন অধিকার করিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রধান বিশেষত্ব, এই ভক্তি। শেষ জীবন পর্য্যন্ত ইনি জন সাধারণের নিকটে ভক্ত বলিয়াই পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু জীবনের শেষভাগে ভক্তি ঘনতর ও গাঢ়তর হইয়া যোগের আকার ধারণ করিয়া ছিল। কেবল উন্মত্ত হওয়াই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অবস্থা মনে করিয়া তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। এই সময়ে যোগাভ্যাসে রত হইলেন। যোগ কেশবচন্দ্রের জীবনের সর্ব্বোচ্চ সোপান। অতএব দেখিতে পাইতেছি ইঁহার জীবন চারিটী প্রণালীর ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। (১) চিন্তাশীলতা অথবা জ্ঞান, (২) কার্য্যশীলতা অথবা কর্ম্ম, (৩) ভক্তি, (৪) যোগ। যাঁহারা জর্ম্মন-দেশীয় হেইগেলের দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে এই দার্শনিকের ক্রম-বিকাশ নিয়ম কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থা প্রথম অবস্থারই পূর্ণ বিকাশ। অথবা কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রত্যক্ষবাদী কম্‌টের ক্রমবিকাশ নিয়মের বিপরীত নিয়ম প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে; কেননা কম্‌ট্‌ যাহাকে Theological stage বলিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, যাহাকে আমরা যোগের অবস্থা বলি, তাহা কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রথম অবস্থায় না হইয়া শেষ অবস্থায় হইয়াছিল। নাস্তিক চূড়ামণি কম্‌টের নিয়ম তিনি এই প্রকারে তাঁহার জীবনদ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এখন জিজ্ঞাস্য এই, কেশবচন্দ্রের জীবনের এই ক্রম বিকাশ বা ক্রম-উন্নতির মূল কোথায়? কোন্ মূলমন্ত্র অবলম্বন করাতে তিনি ধর্ম্মজীবনের বিবিধরাজ্য পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহাকে যে এই সকল বিবিধ রাজ্য পরিভ্রমণ করিতে হইবে তাহা তিনি ধর্ম্মজীবনের উষাকালে কিঞ্চিন্মাত্রও আভাস পান নাই। কোথায় যাইতে হইবে, কোথায় পরিণতি, তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না। বিধাতার অদৃশ্য হস্ত তাঁহাকে চিরদিন ধর্ম্ম

পথে পরিচালিত করিয়াছে। একটী বৃক্ষ যেমন আপনা আপনি বর্দ্ধিত হয়, কেশবচন্দ্রও সেইরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এই ক্রম বিকাশের মূল নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখিতে পাইব যে অতি সহজ ও সাধারণ পন্থা অবলম্বন করিয়া ইনি এত বড় উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই পন্থা আর কিছুই নয়, কেবল জীবনের পবিত্রতা ও প্রার্থনা। এই দুইটীই মানবজীবনে কি মহা বিপ্লব সংঘটন করিতে পারে কেশবচন্দ্রের জীবন তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় ইনি কোন গুরু অথবা শাস্ত্রের সাহায্য পান নাই। কেবল পবিত্রতা এবং প্রার্থনাই তাঁহাকে ধর্ম্মজীবনের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। হৃদয়ের বিশুদ্ধতা এবং সরল প্রার্থনা এই দুইটী সম্বল লইয়া ইনি ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। কেশবচন্দ্রের এই দৃষ্টান্ত আমাদের নিকট যারপর নাই শিক্ষা-প্রদ। কেননা কোন্ সাধন অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মজীবন গঠন করিব, এই চিন্তায় আমরা অনেক সময় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি। কত কৃচ্ছ্রসাধন, মন্ত্র গ্রহণ এবং অস্বাভাবিক উপায়ই না অবলম্বন করি! প্রকৃত পক্ষে আমরা আত্ম-দৃষ্টি-বিহীন, এ জন্যই এই প্রকার ভ্রমে পতিত এবং কুপথ-গামী হইয়া থাকি। জীবনের অভ্যন্তরস্থ গভীর কালিমাই যে আমাদের ধর্ম্মজীবনের পথকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে তাহা আমরা দেখিতে পাই না। জীবন বাহ্য-ভাবে বিশুদ্ধ হইতে পারে, এমন কি চিন্তা পর্য্যন্তও বিশুদ্ধ হইতে পারে, তথাপি জীবনের অভ্যন্তরে অপবিত্রতা থাকা সম্ভব। বিষয়াসক্তি ও স্বার্থপরতাই ধর্ম্ম জীবনের প্রধান অন্তরায়। বৈরাগ্য প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ। সত্য সত্যই মহাত্মা কার্‌লাইল্ বলিয়াছেন, "It is with renunciation that life properly speaking can be said to begin." কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রথম অবস্থায়ই বৈরাগ্য প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি প্রথম জীবনে আমোদ প্রমোদকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বদন মণ্ডল গভীর কালিমায় আচ্ছন্ন থাকিত। বৈরাগ্য

তাঁহাকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী করে নাই, অথচ জীবনের পবিত্রতা সাধনেই ব্রতী করিয়াছিল। বিবেকের উজ্জ্বল আলোকে জীবনের ছোট বড় পাপ সকল ইঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িল; তাঁহার অনুতপ্ত হৃদয় হইতে সরল গভীর প্রার্থনা ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সেই প্রার্থনার দ্বার দিয়া বর্ষার বারি ধারার ন্যায় ঈশ্বরের প্রসাদ বারি তাঁহার হৃদয়কে সিক্ত করিতে আরম্ভ করিল। সেই সিক্ত ভূমি হইতে প্রকাণ্ড ধর্ম্ম-বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া তাঁহার জীবনকে সুশোভিত করিয়াছিল।

কেশবচন্দ্র সেনের আর একটী বিশেষত্ব সামঞ্জস্য। ইহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জীবন শুধু উন্নতিশীল ছিল এমন নহে, উহা সমঞ্জসীভূত উন্নতি প্রকাশ করিয়াছে। তিনি একটী ছাড়িয়া অন্যটী ধরিয়াছেন, পরে সেইটীও ছাড়িয়াছেন, তাঁহার প্রণালী এরূপ নহে। তিনি জ্ঞান ছাড়িয়া কর্ম্মী হন নাই, অথবা কর্ম্ম ছাড়িয়া ভক্ত হন নাই। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগ তাঁহার জীবনে যথাযথরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল। এই সামঞ্জস্য ও সম্মিলন ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই এক অভিনব ব্যাপার। বোধ হয় কোন সাধকের জীবনে ইহা এইরূপভাবে পূর্ব্ব কখনও দেখা যায় নাই। এজন্যই কেশবচন্দ্র সেনকে আজ পর্য্যন্তও আমরা সম্যকরূপ বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না। অথবা আমরা অনেকে এই সামঞ্জস্যের গুরুত্ব অনুভব করি না; কারণ ইহা ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট যারপর নাই সহজ হইয়া পড়িয়াছে। যিনি ইহার প্রবর্ত্তক, তিনি যে একটা মহা ব্যাপার জীবনে সংসিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা কেশবচন্দ্র সেনের সমকালীন লোক, তাঁহার ভাবে ভাবুক, তাঁহার চিন্তায় বর্দ্ধিত এবং তাঁহার আধ্যাত্মিকতা অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের রক্ত মাংসে প্রবেশ করিয়াছে। এই জন্যই তাঁহার জীবনের গুরুত্ব প্রকৃতভাবে আমরা অনুভব করি না। কিন্তু চিন্তাশীল হইয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে এই সামঞ্জস্য, যাহা ব্রাহ্ম সাধারণের সাধারণ সম্পত্তি, তাহার সাধন-পন্থা

কেশবচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইভাব তিনি আপনার জীবনে এতই সত্যরূপে এবং গভীরভাবে সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে উহা ব্রাহ্মসমাজে অনুপ্রবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিল না। হিন্দুজাতির প্রকৃতি সাধারণতঃ একদেশদর্শী। কোন হিন্দু যদি ভক্তি-ভাবাপন্ন হন তবে তাঁহাকে যোগী অথবা কর্ম্মী করা বড়ই কঠিন; আবার তিনি যদি বৈদান্তিকের ন্যায় চিন্তাশীল হন, তবে তিনি হয় কালক্রমে মহা তার্কিক হইয়া দাঁড়াইবেন, না হয় যোগেই একেবারে নিমগ্ন হইয়া পড়িবেন। ধর্ম্মের এই সকল পরস্পর আপাত বিরুদ্ধ ভাবের ভিতরে সন্ধি সংস্থাপন করা কি দুরূহ ব্যাপার তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে পারেন। কেশবচন্দ্র এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বপ্রথমে খ্রীষ্টের ভাব লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কিন্তু কালক্রমে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলুপ্ত প্রায় শ্রীচৈতন্য তাঁহার জীবনে প্রকাশ পাইলেন। তিনি যদি একজন শুধু চিন্তাশীল সমাজ সংস্কারক হইতেন তবে হয়ত চৈতন্যের বিষয়ে ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিতেন এবং সেই সকল গ্রন্থদ্বারা হয়ত কেহ কেহ মহাত্মা চৈতন্যের দিকে আকৃষ্ট হইতেন। কেশবচন্দ্রের প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল। চৈতন্য কোন দিনই তাঁহার চিন্তার বিষয় হন নাই, হৃদয় ও চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিলেন। এই জন্যই কেশবচন্দ্রের জীবনের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি-নদী অবাধে প্রবাহিত হইতে পারিল। আজ কাল ছোট বড় সকল ব্রাহ্মই অল্পাধিক পরিমাণে চৈতন্যের পক্ষপাতী এবং মৃদঙ্গের শব্দে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যের নাম পর্য্যন্তও ভুলিয়া যাইতেছিলেন এবং মৃদঙ্গ করতাল ইত্যাদিকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেছিলেন। কেশবচন্দ্র চৈতন্যকে বঙ্গদেশে পুনরুদ্ধার করিলেন এবং মৃদঙ্গ করতালকে সুসভ্য বাদ্য যন্ত্ররূপে পরিণত করিলেন। ইনি বঙ্গদেশে কেবল চৈতন্যকেই পুনরুদ্ধার করিলেন তাহা নহে, মহাত্মা শাক্যমুনিকেও আমাদের সম্মুখে আনিয়া

ধরিলেন। তৎকালে শাক্যমুনিও বোধ হয় বাঙ্গালীর নিকটে কেবল একটা কথার কথা ছিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বাঙ্গালীর হৃদয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে পরিণত করিলেন; এবং তাঁহার নির্ব্বাণ-তত্ত্ব আমাদিগকে কতকপরিমাণে শিখাইলেন। এইরূপে তিনি ঈশা, চৈতন্য ও শাক্যমুনির মধ্যে এক নিগূঢ় যোগ সংস্থাপন করিলেন এবং আপনার চরিত্র দ্বারা দেখাইলেন যে, এই তিন মহাপুরুষের ভিতরে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই, বরং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এক মহা সম্বন্ধ রহিয়াছে, যে সম্বন্ধ প্রত্যেক সাধকই আপনার জীবনে সংস্থাপন করিতে সমর্থ।

মহাপুরুষদিগের ভিতরে যে নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে কেশবচন্দ্র আপনার চরিত্রদ্বারা কেবল তাহাই প্রতিপন্ন করিলেন তাহা নহে, তিনি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় জাতির মধ্যেও যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিলেন। ইংলণ্ডীয় সভ্যতা এবং ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিকতা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়াই অনেকে আজ পর্য্যন্তও মনে করেন। এখনও আমরা অনেকে ইংলণ্ডের সভ্যতাকে জড়ীয় ভাব মনে করিয়া ঘৃণা করি। উহা যে গভীর আধ্যাত্মিকতার পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম জীবনের আর একটী মহত্ত্ব এই যে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং স্বদেশীয় ভাবুকতার মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদিগের মধ্যে যদি কোন সাধক ভাব-প্রধান হন, তবে তিনি সহজেই সভ্যতার চাকচিক্যকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন। উহার ভিতরে জড়ীয় ভাব ভিন্ন তিনি আর কিছুই দেখেন না। যাঁহারা সভ্যতার ভূষণে বিভূষিত তাঁহাদের মধ্যে যে ভাব-প্রধান আধ্যাত্মিকতা অবস্থিতি করিতে পারে, তাহা হয়ত তিনি কল্পনা করিতেও সমর্থ হন না। তিনি তখন সভ্যতার সৌন্দর্য্যকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৌপিন বল্কল প্রভৃতিরই বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। দুইদিকের সমতা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। কেশবচন্দ্রের জীবন এই সমতার এক

জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি যারপর নাই ভাব-প্রধান লোক ছিলেন ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ভাবুকতা দ্বারা তাঁহার অনেক কার্য্যের ক্ষতি হইয়াছে, ইহাও আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি সভ্যতাকে কোন দিনও পরিহার করিয়াছিলেন? সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ লক্ষণ। আপনার দেহ ও পরিচ্ছদের প্রতি তাঁহার চিরদিন দৃষ্টি ছিল। দৈহিক সৌন্দর্য্যকে তিনি পবিত্রতার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। এইরূপে সভ্যতা এবং ভাবুকতা তাঁহার জীবনে একাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের সম্মিলন তাঁহার জীবনের এক প্রধান ব্রত বলিয়া তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যও কথায় চিরদিন এইভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় সভ্যতার আগমন তিনি বিধাতার বিধান মনে করিতেন। এই জন্যই ইংলণ্ডের সভ্যতাকে অগ্রাহ্য করা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তিনি একই মনে করিতেন। তিনি কেবল সভ্যতা সংস্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে, যাহাতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজগণ ও ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে সখ্যভাব সংস্থাপিত হয় ইহার চেষ্টা আজীবন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে কখনও পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করেন নাই। ইহা তাঁহার প্রথম সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতাতেই (Jesus Christ, Europe and Asia) প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি এইরূপে রাজনৈতিক জগতেরও এক মহা উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে, ইংরাজের প্রতি যে কতকটা সদ্ভাব আমরা দেখিতেছি, মনে হয়, ইহা তাঁহারই চেষ্টার ফল।

অতএব কেশবচন্দ্রের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া উহাতে দুইটী বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ করিলাম; উন্নতি ও সামঞ্জস্য। ইহার জীবনের আরও অনেক বিশেষত্ব আছে, কিন্তু এই দুইটীই মূলীভূত বিশেষত্ব। কেশবচন্দ্র সেনের জীবন *সমালোচনা করিতে হইলে উক্ত* দুইটী বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই করিতে হইবে; নতুবা তাঁহাকে আমরা যথাযথরূপে বুঝিতে সক্ষম হইব না।

এইক্ষণ আমি তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনে ও ধর্ম্মমতে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে ধর্ম্মমত গুলি তাঁহার জীবনেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাঁহার মূল বিষয়গুলি তিনি আপন জীবনে সাধন করিয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহার কথার এত মূল্য এবং এত প্রভাব। পক্ষান্তরে আবার ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা বলাতে লোকে অনেক সময় তাঁহাকে অহঙ্কারী বলিয়াছে। সে যাহা হউক, কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমত তাঁহার ধর্ম্মজীবন হইতে পৃথক নহে।

কেশবচন্দ্র সামঞ্জস্য অথবা সার্ব্বভৌমিকত্বের বার্ত্তাবহ হইয়াই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবন হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি যত কথা বলিয়াছেন এবং যত মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার মূলে এই সামঞ্জস্যের মত। "unsectarianism" অর্থাৎ "অসাম্প্রদায়িকতা" এই কথাটী তিনি যৌবন সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্র কোন্ ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন? তিনি সেখানে গিয়া বলিয়াছিলেন যে খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখিয়া তিনি যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছেন। খ্রীষ্টীয়জগতে এই প্রকার দলাদলি কেন? তারপর ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যাহাতে সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হয় তিনি ইংলণ্ডে তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পর সকল ধর্ম্ম হইতেই সত্য সংগ্রহ করা তাঁহার জীবনের প্রধান কায হইয়াছিল। অবশেষে জীবনের শেষভাগে নববিধান নামে সমুদয় ধর্ম্ম বিধান সমন্বয় করিতে তিনি যত্নশীল হইয়াছিলেন। অতএব ইনি জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই সমন্বয় ক্রিয়াতেই নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে আমি তাঁহার কয়েকটী বিশেষ বিশেষ মত আলোচনা করিব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি নির্ণয় করা কেশব চন্দ্রের প্রথম জীবনের

প্রধান কার্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন্ ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত, তিনি এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক গবেষণা এবং দর্শনশাস্ত্র আলোচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে সহজ জ্ঞানই (Intuition) ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি। এই মতটী ব্রাহ্মসমাজে একেবারে নূতন না হইলেও কেশব চন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজে ইহার প্রাধান্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। অভ্রান্ত শাস্ত্র এবং অভ্রান্ত গুরু যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে তিরোহিত হইল তখন আর কোন্ ভিত্তির উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে? মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মভাব এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের উপরেই দাঁড়াইবে। "সহজ জ্ঞান" এই কথাটী লইয়া সেই সময়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা লালবিহারী দে ইহার প্রতি অনেক ঠাট্টা বিদ্রুপ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় কেশবচন্দ্র যে ভাবে সেই সময় এই মতটী প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে ইহার তীব্র সমালোচনা হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। স্কট্‌লণ্ডের দার্শনিক টমাস্ রিড্ ও হেমিল্টনের নিকট হইতেই যেন এই মতটী তিনি পাইয়াছিলেন এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেন। স্কট্‌লণ্ড দেশীয় দার্শনিকগণ যদিও সহজ জ্ঞানের অনেক কথা বলিয়াছেন তথাপি তাঁহারা এই মতের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। কেশব চন্দ্র যদিও "Intuition" এই কথাটী ব্যবহার করিতেন তথাপি ঠিক স্কট্ দার্শনিকদিগের ন্যায় যে ব্যবহার করিতেন তাহা আমার মনে হয় না। Intuition বলিতে তিনি কি বুঝিতেন? কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্বভাবজাত মত কি? আমি ঠিক তাহা মনে করি না। ডাইসন্ সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যদি Intuitions মান তবে ধর্ম্ম শিক্ষার প্রয়োজন কি?" তাহাতে কেশব চন্দ্র উত্তর করিলেন, "Intuition আছে বলিয়াই শিক্ষা সম্ভব, নতুবা সম্ভব হইত না।" ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে সহজ জ্ঞান বলাতে তিনি কোনও পরিস্ফুট মত মনে করিতেন না, মানবের ধর্ম্ম উপার্জ্জনের যে স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক ক্ষমতা তাহাই

বুঝিতেন। ক্যাণ্টের দর্শন তিনি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহাতে ক্যাণ্টের মতের আভাস আছে। যাহা হউক, খ্রীষ্টান্‌দিগের "orginal Sin" নামক মতের সহিত কেশবচন্দ্রের সহজ জ্ঞানের মতের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মানবের হৃদয় স্বভাবতঃই বিকৃত, ইহা তিনি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিলেন। মানব স্বভাবতঃই নির্ম্মল ও ধর্ম্মপ্রবণ, তৎ-পরিবর্ত্তে এই মত গ্রহণ করিলেন। মানবজাতির এই স্বাভাবিক গুণ আছে বলিয়াই ধর্ম্মের একত্ব, শিক্ষা, ও সার্ব্বভৌমিকত্ব সম্ভব হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবের এই স্বাভাবিক গুণের উপরেই সংস্থাপিত। যাহা হউক, সহজ জ্ঞানের মত তিনি দর্শন শাস্ত্রের কষ্টি-পাথরে ফেলিয়া যে সম্পূর্ণরূপে সত্য প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। প্রকৃত পক্ষে তিনি কোন কালেও দার্শনিক ছিলেন না। কাজে কাজেই তাঁহার মত গুলি দার্শনিকের চক্ষে চিরদিনই অপরিস্ফুট ও অপরিপক্ক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। মোট কথা এই—ধর্ম্মকে কেশবচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে অবস্থা ও শিক্ষার ফল মনে করিতেন না। ধর্ম্ম মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা, অধর্ম্মই অস্বাভাবিক অবস্থা। সাধন দ্বারা অস্বাভাবিক অবস্থাকে স্বাভাবিক করিতে হইবে।

কেশব চন্দ্র ধর্ম্মকে যেমন সহজ ও স্বাভাবিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেইরূপ ধর্ম্ম সাধনের পন্থাও সহজ এবং স্বাভাবিক মনে করিতেন। সমুদয় অস্বাভাবিক উপায়কে তিনি ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন, শুধু তাহা নহে,—পাপ মনে করিতেন। নাসিকা রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম যোগ প্রভৃতি সাধন-পন্থার তিনি যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"হে ব্রাহ্ম, কল্পিত পথে যাইও না। স্বাভাবিক ও সহজ প্রণালী অবলম্বন কর ... ... ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমাদের ধর্ম্ম, অস্বাভাবিক হইতে পারে না। যে পথ অস্বাভাবিক ব্রাহ্ম কখনও সে পথে যান না। শরীর যদি শীতল বায়ু চায়, তাহা স্বাভাবিক প্রণা-

লাভে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রেমের শীতল বায়ু লাভ করাও আত্মার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। সমুদয় অভাবগুলির পূরণ স্বাভাবিক প্রণালীতে হইবে, ইহাতে বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। প্রকৃত ধর্ম্ম আড়ম্বর শূন্য। ইহার সাধন সহজ, যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলই সহজ। বহু কষ্টে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয় না। ... ... যথার্থ ধ্যান করিতে অনেক সময় লাগে, ঈশ্বরে চিত্তসমাধান বহু আয়াস-সাধ্য, সহজে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায় না, নিশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ করিয়া যোগ করিতে হয়, যথার্থ ব্রহ্মযোগী এরূপ কখনও বলেন না।" (সেবকের নিবেদন, তৃতীয় খণ্ড, ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা)। বাস্তবিক চরিত্র যখন সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হয় এবং তাহার সঙ্গে যখন ঈশ্বরপ্রীতি সংযুক্ত হয় তখন ধর্ম্মজীবন স্বভাবতঃই বিকাশ পাইতে থাকে, কোন অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস তখন সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। পবিত্রতাও প্রীতি হইতেই বিশ্বাস সঞ্জীবিত হয় এবং সেই বিশ্বাসই আমাদিগকে ঈশ্বর দর্শনে সমর্থ করে। কেশবচন্দ্র সাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব যে প্রকার স্বাভাবিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপন করিয়াছেন ঈশ্বর তত্ত্বও সেই প্রকারই করিয়াছেন। কি প্রকারে ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইবে? বিশ্বাসই একমাত্র পন্থা। গভীর শাস্ত্রজ্ঞ হইলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এমন নহে; কিন্তু সরল শুদ্ধ-চিত্ত বিশ্বাসী হইলে তাঁহাকে অনায়াসে লাভ করা যায়। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণের জন্য দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনাকে অগ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু ঐ সকল উপায়ের দ্বারা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ একটী সংজ্ঞামাত্র পাওয়া যাইতে পারে, স্বয়ং ভগবানের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেশবচন্দ্র দার্শনিক ছিলেন না; কাজে কাজেই তিনি কোন কালেও ব্রহ্মের দার্শনিক তত্ত্ব নিরূপণে যত্নশীল হন নাই। তিনি সাধক ছিলেন, বিশ্বাসের পন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন এবং বিশ্বাসই শিক্ষা দিয়াছেন। এই বিশ্বাস তত্ত্ব যদ্দ্বারা ঈশ্বর দর্শন ও মানবের নবজীবন লাভ হয়, তাহা তিনি তাঁহার তিনটী প্রকাশ

লেখাতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, " True Faith," " Regenerating Faith," এবং " God-vision in the Nineteenth Century" । আমাদিগের মধ্যে আজকালকার দর্শন শাস্ত্রবিৎ অনেক ব্রাহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র সেনের কি মত ছিল, তিনি কি দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী ছিলেন ? না ইহার মাঝামাঝি কিছু একটা ছিলেন ? প্রকৃত পক্ষে কেশবচন্দ্র সেন এই সকল মতের বিশেষ কোন ধার ধারিতেন না। তিনি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী এই চিন্তায় কখনও প্রবৃত্ত হন নাই। দ্বৈতবাদ বলিতে যদি এই বুঝি যে ঈশ্বরও জগতে এক চিরন্তন বিরোধ রহিয়াছে, এবং ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি নিয়মাধীন করিয়া দিয়াছেন, এইক্ষণ আর তাঁহার সহিত সৃষ্টির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, তবে তিনি নিশ্চয়ই দ্বৈতবাদী ছিলেন না। চিরদিন এই মতের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঈশ্বর জগতে ওতপ্রোত-ভাবে রহিয়াছেন। ইহা কেশব চন্দ্রের নিকট কেবল একটা শুষ্ক দার্শনিক তত্ত্বের বিষয় ছিল না, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বিষয় হইয়াছিল। তিনি নির্ম্মল বিশ্বাস চক্ষে জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আবির্ভাব দর্শন করিতেন। তাই বলিয়া কি তিনি অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন ? তাহা নহে। ভক্তি এবং প্রেম তাঁহাকে অদ্বৈতবাদের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিল। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে এক মঙ্গলময় পুরুষের লীলা সর্ব্বত্র দর্শন করিতেন। জড় বস্তু সকল তাঁহা হইতেই প্রসূত হইতেছে এবং তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে, তিনি শুদ্ধ নিরবয়ব হইয়া সতত এই জড় জগতে ক্রীড়া করিতেছেন। জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ে একত্র হইয়া কেশব চন্দ্রকে এক দিকে ঘোরতর দ্বৈতবাদ এবং অপর দিকে ঘোরতর অদ্বৈত বাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তিনি আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং চিন্তাগত (Intellectual) অথবা Commonsense দ্বৈতবাদী ছিলেন, এই বলিলেই বোধ হয় তাঁহার ব্রহ্মতত্ত্ব যথা যথরূপে প্রকাশ করা হয়।

কেশব চন্দ্রের ব্রহ্মতত্ত্বে একটী ত্রিত্ববাদ (Trinity) আছে। এই ত্রিত্ববাদটীর উপরে মনোনিবেশ না করিলে তাঁহার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকৃত-রূপে পরিগ্রহ করা হয় না। ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের উপরেই ব্রহ্ম-জ্ঞান নির্ভর করে। ঈশ্বর যদি আমাদিগের নিকটে আপনাকে প্রকাশ না করিতেন তবে আমরা তাঁহাকে কখনও জানিতে পারি-তাম না। ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ তিন ভাগে বিভক্ত। তিনি জড় জগতে, আত্মা-রাজ্যে, এবং ইতিহাসে প্রকাশিত। এই তিনের ভিতর দিয়াই আমরা তাঁহার সহিত যোগে সম্বদ্ধ হইয়া থাকি। জড় জগতে তাঁহাকে জ্ঞান ও শক্তিরূপে দর্শন করি, আত্মা-রাজ্যে তাঁহার পুণ্যময় প্রকাশ অবলোকন করি, এবং ইতিহাসে তাঁহার মঙ্গলময় লীলা দর্শন করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হই। কেশব চন্দ্র সেনের ব্রহ্মতত্ত্বের একটী বিশেষত্ব এই যে তিনি ঈশ্বরের প্রথম প্রকাশ অপেক্ষা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকাশে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন. এই স্থলে রাম মোহন রায়, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, ও কেশব চন্দ্র সেনের মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য পরি-লক্ষিত হয়। মহাত্মা রামমোহন রায় জড় জগতে ঈশ্বরের প্রকাশকেই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ জীবাত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশই বিশেষ ভাবে অনুভব করিলেন। এবং তৎপরে কেশব চন্দ্র সেন ইতিহাসে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আত্মা-রাজ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ মহর্ষিই বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রকাশ কেশব চন্দ্র ও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনিও আত্মার ভিতরে পরমাত্মাকে দর্শন করিতে প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহাতে ও মহর্ষিতে একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরমাত্মাকে জীবাত্মার প্রাণরূপেই কেবল দর্শন করিলেন। কেশবচন্দ্রের মতে পরমাত্মা কেবল আত্মার প্রাণ নহেন, পরমাত্মা আত্মার পরিচালক, এবং ধর্ম্ম জীবনের পথ প্রদর্শক; অর্থাৎ কেশব চন্দ্র পরমাত্মাকে জীবাত্মার বিবেকের ভিতর দিয়া দর্শন করিতেন। বিবেকে ব্রহ্ম-দর্শন কেশব চন্দ্রের

একটী বিশেষ মত। বিবেকের পরিচালনা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া তিনি গ্রহন করিলেন। এই আদেশ-বাদ ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম হইতেই তাঁহার জীবনে অবস্থিতি করিতেছিল। তিনি প্রথম হইতেই এই শিক্ষা দিয়াছেন যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়। সরল প্রার্থনা ও প্রত্যাদেশ (Inspiration) পরস্পর অভিন্নরূপে সংবদ্ধ, ইহা তাঁহার Inspiration নামক বক্তৃতা পাঠ করিলেই পরিস্কার বুঝিতে পারা যায়। যদিও ধর্ম্ম জীবনের প্রথম হইতেই এই মত কেশব চন্দ্র প্রচার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার জীবনের শেষ ভাগেই ইহার বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়াছে। তিনি ইহার এত দূর পক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে ইহার নিকট আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে অনেক সময়ে বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। এজন্যই কেশবচন্দ্র অনেক গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানও আদেশের সামঞ্জস্য কেশবচন্দ্রের জীবনে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থলে তিনি আপনার সামঞ্জস্যের মত বিশেষ ভাবে বজায় রাখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি আদেশবাদ অপ্রতিহতরূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই মতটী আমাদের বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। জগতের প্রায় অধিকাংশ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঈশ্বর কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ মহাপুরুষের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এবং সে গুলি লিপিবদ্ধ হইয়া অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। কেশব চন্দ্র এই মতের দারুণ বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহেন, তিনি ইহা ঘুণাক্ষরেও মানিতেন না। ঈশ্বর জাতি ও ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকলের সহিতই কথা কহেন, সকলের বিবেকের ভিতর দিয়াই তিনি আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। শুধু তাহা নহে, ঈশ্বর অবিশ্রান্ত সর্ব্বদাই সকলের নিকটে আদেশ প্রেরণ করিতেছেন। তিনি এখন কথা কহিলেন, আবার অন্য সময় কহিলেন না, নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন তাহা নহে। ঈশ্বর আত্মাতে ক্রমাগত তাঁহার

ইচ্ছা পরিস্ফুট করিতেছেন। সিদ্ধাবস্থার পরিমাণ অনুসারে সাধক ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে সমর্থ হন। জীবন যখন নির্ম্মল হয়, কুটীল বুদ্ধি যখন তিরোহিত হয়, তখনই ঈশ্বরের ইচ্ছা আত্মায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। জড় জগতে ঈশ্বর যেমন অবিরাম কার্য্য করিতেছেন ও আপনার জ্ঞান-শক্তি প্রকাশ করিতেছেন, তেমনি আত্মা-রাজ্যেও আপনার পুণ্যস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন রাজ্যেই তাঁহার প্রকৃতিগত কার্য্যের বিরাম নাই। তিনি অনন্ত ক্রিয়াশীল পরমেশ্বর। কেশবচন্দ্র সেন এইরূপে অস্বাভাবিক গুরুবাদ একেবারে খণ্ডন করিলেন। গুরু প্রত্যেক হৃদয়ে নিত্যবিরাজমান। তাঁহার আদেশ শ্রবণ করাই জীবনের মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়।

কেশবচন্দ্রের মতে ঈশ্বরের তৃতীয় প্রকাশ ইতিহাসে। ইতিহাস তিন প্রকার; জড় ও প্রাণী জগতের ইতিহাস, মনুষ্যের ব্যক্তিগত ইতিহাস, এবং মানব-সমাজের ইতিহাস। এই তিন প্রকার ইতিহাসেই ঈশ্বর প্রকাশিত। এ সকলের মধ্যেই তাঁহার লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ের বিবর্ত্তনবাদ, জড় জগতে ঈশ্বরের লীলার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কেশবচন্দ্র সেন বিবর্ত্তনবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ডার্‌উইন্ প্রভৃতি পণ্ডিত দিগকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ইতিহাসে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জীবনের ঘটনাবলীমধ্যে কি প্রকারে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে সক্ষম, তাহা তিনি তাঁহার 'God vision in the nineteenth century' নামক বক্তৃতার শেষ ভাগে অতি হৃদয়গ্রাহীরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে প্রত্যেক ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তিরই উপকার সম্ভাবনা। আমরা স্বার্থপর ভাবে আমাদের দৈনিক খাওয়া পরা সুখ স্বচ্ছন্দতার ভিতরে কেবল নিজের হাতই দেখিতে পাই; কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তি তাহার ভিতরে মঙ্গলময়

বিধাতার প্রেম-বিধান দর্শন করিয়া কৃতার্থ হ'ন। এইরূপে জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক ঘটনার ভিতরে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই এই বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে আমরা স্থির ভাবে দাঁড়াইতে সক্ষম হইতে পারি।

তৃতীয় প্রকার ইতিহাসে ঈশ্বরের প্রকাশ। মানব-সমাজের ইতিবৃত্ত কেবল কতকগুলি অর্থহীন ঘটনা পুঞ্জ নহে। সেই ঘটনা সমূহে বিধাতার হস্ত অবস্থিতি করিতেছে এবং তদ্দ্বারা ঘটনা সমূহ নিয়মিত হইতেছে। ইতিহাস, কেশবচন্দ্রের নিকট ঈশ্বরের বিধানই প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু বিধাতার বিধান ইতিহাসে কি প্রকারে ধরিব? জন সাধারণের মধ্যে কি? তাহা নহে। জন সাধারণের যাঁহারা নেতা তাঁহাদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের বিধান বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'Jesus Christ Europe and Asia' নামক বক্তৃতাতেই সর্ব্ব প্রথমে এই মতের আভাস পাওয়া গিয়াছিল। তৎপর 'Great men' নামক বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি এই মত মহাত্মা কার্‌লাইলের নিকট হইতেই অনেকটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ কেশবচন্দ্র ও কার্‌লাইলের মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই মহাপুরুষদিগকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন। 'কেশবচন্দ্রের মতে মহাপুরুষের দ্বারাই মানবসমাজের উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। তাঁহারাই মানব জাতির প্রতিনিধি হইয়া বিশেষ বিশেষ ভাব প্রচার করিয়াছেন ও তাহা সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। এই সকল ভাব তাঁহারা আপনার বুদ্ধি বলে নহে, ঈশ্বর-প্রসাদে লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্যই কেশবচন্দ্র তাঁহাদের কার্য্যে কেবল মানবীয় ক্ষমতা দর্শন করিতেন না, কিন্তু ঐশ্বরিক ভাব ও শক্তি প্রত্যক্ষ করিতেন। মহাপুরুষগণ দশ জনের মধ্যে এক জন, কেবল নিজের চেষ্টায় উন্নতাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র এই মতে পক্ষপাতী ছিলেন না। মহাপুরুষদের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ ইচ্ছা বিধান প্রকাশিত হইতেছে, তিনি ইহাই দেখিতেন। তাঁহারা সময়ে

পূর্ণতায় বিশেষ কোন কার্য্য সংসিদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। অথচ ইহার ভিতরে অলৌকিক ব্যাপার কিছুই নাই। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের অবতার ইহা কেশবচন্দ্র কখনও মনে করিতেন না; তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি ইহাই তিনি বিশ্বাস করিতেন। ঈষা, মূষা, বুদ্ধ, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য ইহারা কখনও ঈশ্বরের অবতার নহেন; কিন্তু তাঁহার প্রেরিত পুরুষ। তাঁহাদের আগমন ও তাঁহাদের ধর্ম্ম ধূমকেতুর ন্যায় আকস্মিক ঘটনা নহে। কিন্তু তাহা ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়াই সংঘটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই কেশবচন্দ্র বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে, তিনি তখন এই কথা বলিতেন। প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁহার ভিতরে এই মতও বর্ত্তমান ছিল যে, সকল ধর্ম্মেই কেবল সত্য আছে তাহা নহে, সকল ধর্ম্মই সত্য। এই কথা কাহারও কাহারও নিকট অতীব বিস্ময়কর হইতে পারে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম ঈশ্বরের বিধানে পৃথিবীতে আসিয়াছে। কাজে কাজেই কোন ধর্ম্মই সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক ও পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক ধর্ম্মেই ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই সকল ভ্রম ও কুসংস্কার সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলীভূত সত্য ঈশ্বর প্রেরিত সত্য এবং তাহা অপরিত্যাজ্য। এইমত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু ইহা নববিধান ঘোষণার সময় হইতেই বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র পুরাতন ধর্ম্ম সকলের মধ্যে শুধু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব দর্শন করিতেন তাহা নহে, সেই সকলের ভিতরে বিধানের শৃঙ্খলাও দেখিতেন। প্রত্যেক ধর্ম্মবিধান পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানের সহিত গূঢ়ভাবে সংবদ্ধ। একটী আর একটীকে ছাড়িয়া পৃথিবীতে আসে নাই, প্রত্যেক বিধান তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিধানেরই পূর্ণতা। এই মতটী তিনি "We the Apostles of the New Dispensation" বক্তৃতাতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে বলা

আবশ্যক যে, তিনি বিধান সমূহের শৃঙ্খলা এবং ক্রমবিকাশ যথা-যথরূপে প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাবপ্রধান মন এই প্রকার নির্দ্ধারণের ঠিক উপযোগী ছিল না। তিনি এই কাজটী ভাবুকতা দ্বারাই সম্পন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন ; বাস্তবিক তাহা হইবার নহে। ইহাতে বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক ঘটনা নিচয়ের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যাহা হউক স্থূলতঃ ধরিতে গেলে তিনি একটী গুরুতর এবং সময়োপযোগী মতেরই অবতারণা করিয়াছিলেন। আজকালকার অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের ভিতরেও এই মত দেখিতে পাওয়া যায়। হিগেলেরও (যাঁহার নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি) এই মত ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বিধান-শৃঙ্খলার বহির্ভূত একটী ঘটনা নহে। বর্ত্তমান যুগে ইহা একটী নূতন বিধান এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বিধান সকলের পূর্ণতা সম্পাদন করিতেই ইহার আগমন। ইহা মনুষ্য রচিত ধর্ম্ম নহে। "রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা কেশবচন্দ্র স্বীয় বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষে এই ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছেন", এই মত কেশবচন্দ্র সেন ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের এক নূতন বিধান" শেষ জীবনে কেশবচন্দ্র এই ভাব লইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্ম সকল যেমন ঈশ্বরের বিধান, এই ধর্ম্মও তেমনি ঈশ্বরের বিধান ; ইহাও সময়ের পূর্ণতায় ভারতবর্ষে অভ্যুদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকের এই প্রকার ধারণা যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম একটী দার্শনিক ধর্ম্ম, ইহা সুতীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি হইতেই প্রসূত হইয়াছে ; পূর্ব্বাপর ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। কেশবচন্দ্রের বিধানের মত এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছিল। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বয়ং বিধাতার লীলা, ইহা মনুষ্য-রচিত ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের বিধান, এই কথাটী প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই স্বীকার্য্য নতুবা ইহাদ্বারা কি করিয়া তিনি আপনার পরিত্রাণ সাধন করিতেছেন। কিন্তু "নূতন" এই কথাটীর প্রতিকূলে অনেকে আপ

করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্রের মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম একদিকে দেখিতে গেলে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সন্দেহ নাই এবং ইহা অনন্তকাল হইতেই পৃথিবীতে স্থিতি করিতেছে। ইহা সার্ব্বভৌমিক, কেননা এই ধর্ম্ম মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্মভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর একদিকে দেখিতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব আছে, নূতনত্বও আছে। সেই বিশেষত্ব ও নূতনত্ব কি? সামঞ্জস্যই ইহার নূতনত্ব। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল ধর্ম্ম-বিধান অভ্যুদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মে সমুদয়ের সামঞ্জস্য হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহাই ইহার নূতনত্ব এবং বিশেষত্ব। ব্রাহ্মধর্ম্ম একাঙ্গীন সাধনের ধর্ম্ম নহে, ইহা পূর্ণাঙ্গ সাধনের ও পূর্ণ বিকাশের ধর্ম্ম। যাঁহারা এই আদর্শকে মতে অথবা কার্য্যে পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা ঈশ্বরের বিধানকে জীবনে অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমাদের দুর্ব্বলতা বশতঃ এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম না হইতে পারি, কিন্তু কখনও ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। সমুদয় ধর্ম্ম-বিধান ব্রাহ্মধর্ম্ম সামঞ্জস্য করিতেছে, এই কথাটী লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। "কোথায় সে সামঞ্জস্য, আমরা তো তাহার কিছুই দেখিতে পাই না, কেশবচন্দ্র সেন একটা মনঃকল্পিত ব্যাপার লইয়া কতকটা গোলমাল করিয়া গিয়াছেন" এইরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে সমুদয় ধর্ম্ম-বিধান সামঞ্জস্য হইতেছে কি না, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে প্রত্যেক ব্রাহ্ম-জীবন, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের জীবন, বিশেষভাবে পাঠ করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, ইহা একটা মনঃকল্পিত ব্যাপার নহে, বিধাতার বিধানে ইহা বাস্তবিকই সংঘটিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম-জীবন অল্পাধিক পরিমাণে এই সামঞ্জস্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই নূতন ধর্ম্ম ঈশার বিশ্বাস, প্রার্থনা ও কার্য্যশীলতা, শাক্যমুনির যোগ, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি এবং মহম্মদের উৎসাহ ও তেজ কতক পরিমাণে

সম্মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলন, যাহা ভারতবর্ষে এক অভিনব ব্যাপার, তাহার ভিতরে কি আমরা বিধাতার হস্ত নিরীক্ষণ করিব না? কেশবচন্দ্র চিন্তা ও লেখনী দ্বারা সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় সপ্রমাণ করিতে কখনও সচেষ্ট হন নাই। তিনি নিজের ও অন্যান্য ব্রাহ্মের জীবন, চরিত্র দ্বারাই ইহা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কি না, তাহা কেবল তাঁহার জীবন, নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের বিধান, এটী ব্রাহ্মের নিকটে যারপর নাই আশা-প্রদ ও উচ্চভাব। কেশবচন্দ্র যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মে ও ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে যত্নশীল ছিলেন, আমরা প্রত্যেকেই যদি সেইরূপ হই, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমাদের আকর্ষণ শতগুণ বাড়িয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে, ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া যদি অবিশ্বাসীর ন্যায় বিচরণ করি এবং বলিয়া বেড়াই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছুই করে নাই ও কিছুই করিতেছে না, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে হইতে পারে? এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে যে মহাব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা অবিশ্বাসী হইয়া নাও দেখিতে পারি, কিন্তু তাহা আমাদের ভবিষ্যৎবংশীয়েরা দেখিয়া অবাক্ ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে। কেশবচন্দ্র যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের বিধান" এই ভাবটী সর্ব্বোচ্চ কীর্ত্তি। নববিধানের নামে তিনি অনেক কাণ্ড কারখানা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিতরে অনেক ভ্রান্তি আছে; সেই সকল আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারও কিছুই, আলোচনা করা হইল না। তাঁহার সমুদয় মত বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইলে একখানা সুদীর্ঘ পুস্তক রচনার প্রয়োজন। আশা করি কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজে তাহা হইবে।

উপসংহারে কেশবচন্দ্রের জীবন কি প্রকারে আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। কোন একটী জীব-

আলোচনা করিতে হইলে একদিগে বিদ্বেষ এবং অপরদিগে নর পূজার ভাব পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। বিদ্বেষপরায়ণ হইলে কোন সাধুর জীবনই আমাদের নিকট শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে না, তাঁহার মহদ্ভাবগুলি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে এবং দোষ, ত্রুটীগুলি বৃহদাকারে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। অপরদিকে অস্বাভাবিক আসক্তি থাকিলে দোষ ত্রুটীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িতে হয়। তাহার ফল এই হয় যে, উচ্চভাব গুলিকেও যথাযথরূপে বুঝিতে পারা যায় না, সামান্য সদ্‌গুণও অমানুষিক স্বর্গীয় ভাব বলিয়া অনুভূত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে এই দুই ভাবই বর্ত্তমান। কেহ কেহ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিতেছেন, আবার কেহ বা তাঁহাকে দেবতার আসন দান করিতেছেন। উভয় দিকেই ভ্রমান্ধতা এবং সত্যানুরাগের অভাব। ঠিকভাবে কেশবচন্দ্রকে বুঝিব এই ভাব অতি অল্পলোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভিতরে যদি ভ্রম ও ত্রুটী থাকে তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত এবং লজ্জিত হইবার প্রয়োজন কি? ভ্রম ত্রুটী তো থাকিবেই থাকিবে। বাস্তবিক সেগুলি যদি আমি পরিষ্কাররূপে না বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, গুণ গুলিও আমি বুঝি নাই। আমাদিগের জ্ঞানের প্রকৃতিই এই যে, উহা দোষ গুণের তুলনা দ্বারাই সত্য নির্ণয় করিয়া থাকে। সত্যই বাস্তবিক আমাদিগের লক্ষ্য। কোনও ব্যক্তি বিশেষকে মহীয়ান্ করিতে আমরা আসি নাই। একমাত্র পরমেশ্বরই ব্রাহ্মসমাজে মহীয়ান্ হইবেন। আর সকলেই তাঁহার দাসানুদাস। বাস্তবিক যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মসমাজ কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুচিত সমাদর করিতে গিয়া সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে, তাহা হইলেই দুঃখ ও ক্ষোভ রাখিবার আর স্থান হয় না। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে দশজনের মধ্যে একজন, ঈশ্বর প্রসাদে তিনি প্রভূতশক্তি এবং ধর্ম্মভাব লাভ করিয়াছিলেন। আমরা সেই জন্য তাঁহাকে যথোচিত সম্মান

ও ভক্তি প্রদান করিব। এমন সময় আসিয়াছে যে, কেশবচন্দ্র সেনের জীবন সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমান সময়ে যে নানাপ্রকার মত-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অনেকগুলি কেশবচন্দ্র সম্বন্ধীয়। ব্রাহ্মসমাজে শান্তি সংস্থাপন করিতে হইলে তাঁহার সম্বন্ধে মত-বিভাগ যতই বিলুপ্ত হয় ততই ভাল। প্রকৃতপক্ষে মত-বিভাগ দূর করিবার জন্যই যে কেবল কেশবচন্দ্রের জীবন আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা নহে। ইহাঁর জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ এতই পরিষ্কাররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল যে, ব্রাহ্ম মাত্রেরই তাহা পরিষ্কাররূপে অনুভব করা উচিত; এবং তদ্দ্বারা ব্রাহ্মজীবনের উন্নতি নিশ্চয়ই সংসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। অতএব আশাকরি কেশবচন্দ্রের জীবন ব্রাহ্মসমাজে এখন হইতে বহুলরূপে আলোচিত হইবে।